

ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর উত্তরণ : ঊনবিংশ শতকের তিন মহিলা চিকিৎসকের অবদানের ভিত্তিতে একটি ফিরে দেখা অধ্যায়

নূপুর দত্ত

সারাংশ

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে সমাজ সংস্কারের ফলে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও অনেক সংস্কার করা হয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে এই শিক্ষার সূত্রপাত হয়। নবজাগরণের ফলে সমাজে আলোকিত বুদ্ধিজীবীর সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে বরণ করার সাথে সাথে স্ত্রী শিক্ষাকেও সমর্থন করে। স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত যে সব কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল তারা সেগুলি দূর করতে তৎপর হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়টি জোরালো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষা বহুলাংশে বিস্তারলাভ করে। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সমাজ সংস্কারকরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক সরকার এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তারা ভারতের অন্তরমহলে প্রবেশ করতে চাননি। কিন্তু খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ও ভারতের সমাজ সংস্কারকদের চাপে ব্রিটিশ সরকার কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হন। ব্রাহ্ম মেয়েরা ও খ্রীষ্টান ধর্মাস্তরিত ভারতীয় নারীরা উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। শিক্ষা ও চিকিৎসা – এই দুটি বিষয় ছিল তাদের মূল আগ্রহের বিষয়।

ধীরে ধীরে মেডিকেল কলেজগুলি নারীদের ভর্তির অনুমতি দিলে চিকিৎসাবিদ্যায় নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু তাদের এই পথ মোটেও সুগম ছিল না। নানা সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা বিদ্যায় কিছু ভারতীয় নারী কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। এই লেখনীর মাধ্যমে আমরা ঔপনিবেশিক বাংলার তিনজন কৃতি চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, যামিনী সেন ও হৈমবতী সেনের কৃতিত্ব ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে তাদের উত্তরণের পর্যায়টি ফিরে দেখব।

শব্দসূচক: চিকিৎসা বিদ্যা, স্ত্রী-শিক্ষা, ঔপনিবেশিক বাংলা, পাশ্চাত্য চিকিৎসা, হাসপাতাল, অন্তঃপুরবাসিনী, মহিলা চিকিৎসক।

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতকের ভারতে সমাজ সংস্কারের হাত ধরে শিক্ষার দ্বার ভারতীয় মহিলাদের সামনে খুলে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। নারীরা শিক্ষালাভ করলে তাদের বৈধব্যপ্রাপ্তি হবে; এমন কুসংস্কার নব্য শিক্ষিত ভারতীয়দের মন থেকে দূর হতে থাকে। সমাজ সংস্কাররা উপলব্ধি করলেন যে স্ত্রী-শিক্ষা পরিবারকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করবে এবং নতুন প্রজন্মের হিতার্থে ব্যবহৃত হবে। এর সাথে আরও একটি বিষয় যুক্ত হয়েছিল। নব্য শিক্ষিত যুবকরা তাদের সহধর্মিণী হিসেবে নিরক্ষর নারীদের বিবাহ করতে অস্বীকার করে। তারা স্ত্রীরূপে এমন কাউকে প্রত্যাশা করা শুরু করে যারা তাদের বৌদ্ধিক ও চিন্তাশীল মননকে বুঝতে পারবে। এরকম চাহিদার জন্যে বিবাহযোগ্য কন্যার পিতারা তাদের কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে সুপাত্র পাবার আশায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে বাধ্য হন। Geraldine Forbes মন্তব্য করেছেন যে, এই নতুন প্রজন্মের নারীরা তাদের স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে সভ্য সমাজের অংশে পরিণত হয়েছিলেন। (Forbes, 2008)

প্রথম থেকেই স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়। মেয়েদের পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্য, সূচিকর্ম, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সংযুক্ত করা হয়েছিল। অন্যদিকে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ছেলেদের পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা হবার লক্ষ্যে পরিচালিত হতো। সক্রিয়ভাবে কোনো পেশার সাথে নারীদের সংযুক্তিকরণ তখন ধারণার অতীত ছিল, এইরকম একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ শতকে কিছু আত্মপ্রত্যয়শীল নারী চিকিৎসাবিদ্যাকে পেশারূপে গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ বিশেষ সহজ ছিল না। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে খ্রীষ্টান মিশনারী, ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ ও সর্বোপরি ঔপনিবেশিক সরকারের অবদান ছিল। (Mukherjee, 2012)

- স্ত্রী শিক্ষা থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায় :

ক) খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে নারীরা পর্দার অন্তরালে জীবন অতিবাহিত করত। Janaki Nair দেখিয়েছেন যে Zenana was considered to be a place of dirt, darkness and disease” — অর্থাৎ মহিলামহল বলতে অপরিষ্কার অন্ধকার ও রোগগ্রস্ত একটা পরিবেশকে বোঝাত (Nair, 1990)। এই রকম পরিবেশে প্রথম পা রাখেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড থেকে বহু মিশনারী মহিলা ভারতে আসেন। এদের কতগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পর্দার আড়াল থেকে জরাগ্রস্ত নারীদের উদ্ধার, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার। এরা নিজেদের উদ্যোগে দেশীয় মহিলাদের চিকিৎসা ও প্রসবকারিণী বা দাই-দের প্রশিক্ষণের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ভারতীয় পিতারা যখন সুপাত্র পাবার আশায় তাদের কন্যাদের লেখাপড়া শেখাবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন এই মিশনারী মহিলারা শিক্ষিকারূপে বাড়ির অন্তরমহলে প্রবেশ করেন। এরা খুব কাছ থেকে তাদের ছাত্রী ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হন। অল্পবয়সে মাতৃহের ফলে শিশুমৃত্যু, মেয়েদের

প্রসবজনিত পীড়া দেখে তারা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। এছাড়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারকল্পে তারা 'জেনানাঙ্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪০-৮২ সালের মধ্যে এই স্কুল অতিমাত্রায় সাফল্যলাভ করে। বাঙালী বিধবারাও খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনুকূল্য পান। তারা উপলব্ধি করেন যে শিক্ষাগ্রহণের ফলে বৈধব্যযোগের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তারা নতুন উদ্যমে লেখাপড়া শুরু করেন, এদের মধ্যে অনেকেই গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা করেন ও পরবর্তীকালে শিক্ষিকা বা চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন (Mukherjee, 2012)। ১৮৪০ সালে মহিলাদের একশো (১০০) শয্যার একটি হাসপাতাল কলকাতা মেডিকেল কলেজের মধ্যে তৈরী হয়। তবে পর্দার ওপার থেকে খুব কম সংখ্যক মেয়েদেরই এখানে দেখা গিয়েছিল। এই হাসপাতালে প্রসবকালের সহায়ক হিসেবে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এমনকি forcep এর সাহায্যে প্রসবের অত্যাধুনিক কৌশলেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু লজ্জা পেয়ে বেশিরভাগ নারীই এই হাসপাতালে আসতেন না (Mukherjee, 2017)।

খ) ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের অবদান

ভারত তথা বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা রাধাকান্ত দেবের মতো সমাজ সংস্কারকরা স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অন্যদিকে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিল। তবে কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রী শিক্ষার ধারণা একটু ভিন্ন ছিল। তিনি মনে করতেন নারীদের জ্যামিতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পাঠের কোনো প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, রন্ধন কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করলে তারা আদর্শ স্ত্রী এবং মা হতে পারবেন (Mukherjee, 2012)।

তবে ব্রাহ্ম সমাজের বহু সদস্য শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শশীপদ ব্যানার্জী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বোস প্রমুখ স্ত্রী-শিক্ষার সম্প্রসারণে নিরলস প্রয়াস করে গেছেন। মিস অ্যান্ট অ্যাকরয়েড ১৮৭২ সালে কলকাতায় আসেন ও ১৮৭৩ সালে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। প্রগতিশীল ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এই স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারকানাথকে সমর্থন করেন। তারা সমদর্শী দল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন ও একই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সমদর্শী দলের উদ্যোগে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রথমদিকের ছাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের কন্যা সরলা ও অবলা, জগদীশ চন্দ্র বোসের সহোদরা স্বর্ণপ্রভা, মদনমোহন ঘোষের সহোদরা বিনোদিনী ও ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী বসু ছিলেন উল্লেখযোগ্য। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮২ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে প্রথম কলাবিভাগের স্নাতক হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দুজন মহিলা স্নাতকরূপ এদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। (Mukherjee, 2012)

স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম পথিকৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় ৩৫ টি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। লেফটেনেন্ট গভর্নর F.J. Halliday বিদ্যাসাগরকে এই স্কুলগুলির আর্থিক অনুদান দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তার প্রতিশ্রুতি রাখেননি। হতদ্যম না হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ খরচে এই স্কুলগুলি পরিচালনার দায়িত্ব নেন। বাংলার জমিদারদের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উত্তরপাড়ার

ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর উত্তরণ : ঊনবিংশ শতকের তিন মহিলা চিকিৎসকে অবদানের ভিত্তিতে একটি ফিরে দেখা অধ্যায়

রাজকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এ বিষয়ে অন্যতম। এছাড়া লাখোটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ঠনঠনিয়ার দিগম্বর মিত্র স্ত্রীশিক্ষা খাতে অনুদান দিয়েছিলেন (Mukherjee, 2012)।

গ) সরকারী উদ্যোগে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার

১৮৫৪ খ্রীঃ চার্লস উডের নির্দেশনামায় স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলা প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের Inspector of Schools, R.L Martin উপলব্ধি করেন যে উপযুক্ত শিক্ষিকা না পাওয়া গেলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ১৮৬৩ সালের ১১ই মে তিনি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল। পেশাগত জগতে বাংলার মহিলাদের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তবে একমাত্র কলকাতার বেথুন কলেজ ছাড়া ভারতের কোথাও মহিলাদের জন্য কলেজ শিক্ষার প্রচলন ছিল না। ১৮৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিকিট ঘোষণা করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা, নারী ও পুরুষ উভয়েও অংশগ্রহণ করতে পারবে (Mukherjee, 2017)।

এইভাবে নারীরা ধীরে ধীরে শিক্ষা এবং চিকিৎসা বিদ্যাকে পেশারূপে গ্রহণ করার প্রথম পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হল। ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পন্ডিতিয়া রামাবাসী শিক্ষা কমিশনকে জানান যে শিক্ষা ও চিকিৎসার পেশায় থাকা নারীদের জন্য সরকারকে আরও যত্নবান হতে হবে। শিক্ষার সাথে সাথে চিকিৎসা বিদ্যাতেও নারীদের অভাব অনুভূত হল। বাড়ীর অন্দরমহলে পুরুষ ডাক্তার ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। যে সব হাকিম বা বৈদ্য বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকত, তারা রোগীনির নাড়ি টিপে দেখতে পারত। রোগীনির কোন সমস্যা থাকলে তাকে পরীক্ষা করার অনুমতি তাদের ছিল না। বিলেত থেকে যে সব মেম ডাক্তার এসেছিল তাদেরকে দেশীয় নারীরা ভয় পেত। এছাড়া এদের সাথে ভাষাগত ব্যবধানও ছিল। রোগীনির সমস্যা সঠিকভাবে এরা অনুধাবন করতে পারত না। তাই দেশীয় মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় (Mukherjee, 2017)। চিকিৎসাবিদ্যায় মহিলা ছাত্রী সর্বপ্রথম মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজ ব্যারিস্টারের পত্নী মেরি-স্কারলিব মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে দেশীয় ছাত্রীদের ভর্তির জন্য প্রস্তাব রাখেন। ১৮৭৫ সালে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স করার জন্যে চারজন ছাত্রীকে সুযোগ দেওয়া হয়, তার মধ্যে মেরি নিজেও ছিলেন। ১৮৮১ সালে ব্রাহ্ম নেতা দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলা দাস ও Miss Allen D'Abreu বাংলার সরকারের থেকে বৃত্তিলাভ করে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্যে যাত্রা করেন। (Mukherjee'2012) ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার ছাত্রীদের জন্যে উন্মুক্ত হল (Burton 1996)। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী ছিলেন। ওই বছরই বোম্বাই মেডিকেল কলেজে ম্যাক্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রীদের একটি পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রমে ভর্তি হবার সুযোগ প্রদান করে।

• চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর অনুপ্রবেশ

চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর অনুপ্রবেশ সকলে সঠিক মেনে নিতে পারেনি। সমকালীন পত্র পত্রিকাগুলি মূল্যবান জীবনগুলি নিয়ে সরকারের খেলা করার তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে। নারীদের ডাক্তাররূপে দেখতে তখনো ভারতীয় সমাজ

প্রস্তুত ছিল না। তারা নারীদের সেবিকারূপে দেখতেই বেশি অভ্যস্ত ছিল। খুব সম্ভবত, পুরুষ ডাক্তারদের হিংসা, মহিলা ডাক্তারকে নিজেদের সহকর্মী হিসেবে মানার অনীহা ও নিজেদের প্রতিপত্তি হ্রাসের ভীতি মহিলা ডাক্তারদের সামনে নানা প্রতিকূলতার কারণ ছিল। এই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে মহিলা চিকিৎসকদের পথ চলা শুরু হয়েছিল। গোঁড়া পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা এবং সাথে সাথে কর্মজীবনের কঙ্করময় অভিজ্ঞতাও ছিল। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বাংলার তিনজন কৃতী চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, যামিনী সেন ও হৈমবতী সেনের অভিজ্ঞতার কাহিনী পর্যালোচনা করব।

ক) কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

কাদম্বিনী বসু ছিলেন ভারতের প্রথম স্নাতক মহিলা। ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে বিবাহ করে তিনি কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নামে পরিচিত হন। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু MB ডিগ্রীর পরিবর্তে GBMC ডিগ্রী লাভ করেন। কারণ মেডিসিন বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর আর.সি চন্দ্র তাকে চূড়ান্ত practical পরীক্ষায় অকৃতকার্য ঘোষণা করেন প্রফেসর চন্দ্র মেডিকেল কলেজে ভারতীয় ছাত্রীদের ভর্তির বিরোধিতা করতেন। কাদম্বিনীর পাঁচ বছরের ছাত্রী জীবনে তিনি মাসিক ২০ টাকা সরকারী বৃত্তি পেতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি Graduate Medical College of Bengal সার্টিফিকেটের সাহায্যে চিকিৎসকরূপে স্বীকৃতি পান। পাস করার পরে তিনি ইডেন হাসপাতালে যোগদান করেন। সেখানে তাকে চিকিৎসকের মর্যাদা দেবার পরিবর্তে প্রসবকালীন সেবিকার মত ব্যবহার করা হত। হাসপাতালে ডাক্তাররাও বর্ণবৈষম্য করতেন। ভারতীয় মহিলাদেরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। আর ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকরা এই শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকদের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। হতাশ হয়ে কাদম্বিনী চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। (Mukherjee, 2017)

মনস্কুল হয়ে কাদম্বিনী বিদেশে গিয়ে ডিগ্রী অর্জন করার পরিকল্পনা করেন তিনি নিজস্ব উদ্যোগে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে এই চিকিৎসালয়টি দাতব্য চিকিৎসালয় হিসেবে কাজ করত। কিন্তু এবারেও তিনি দেশীয় মানুষের আস্থা অর্জন করতে বিফল হন। এরপর কলকাতার জেনানা হাসপাতালে যোগ দেন। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাকে কোনো স্থায়ী পদ দেওয়া হয়নি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাদম্বিনী স্কটিশ কলেজ থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় আরও একটি ডিগ্রী লাভ করেন। (দেব, ২০১০) ফেরার পরে ডাফরিন হাসপাতালে উচ্চপদে চাকরী লাভ করেন। এবার তিনি তার যোগ্য মর্যাদা পান। মাসিক ৩০০ টাকা বেতনের বিনিময়ে তিনি ডাফরিন হাসপাতালে কাজ শুরু করেন। সমকালীন অনেক পুরুষ ডাক্তারের তুলনায় তার বেতন বেশি ছিল। এই হাসপাতালে শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসার ওপর জোর দেওয়া হতো। শীঘ্রই পুনরায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। কাদম্বিনী নিজের পেশায় অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। (দেব, ২০১০)

১৮৯৫ সালে কাদম্বিনী নেপালের রাজমাতার চিকিৎসার জন্যে নেপাল যান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নেপালের রাজপরিবারের মহিলাদের ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করেন। কাদম্বিনীর ব্যবহার ও চিকিৎসার দ্বারা তারা এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে তারা তাকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়েছিলেন। পুণ্যলতা তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে রাজপরিবারের পক্ষ থেকে কাদম্বিনীকে মূল্যবান গহনা, রূপোর দ্রব্যাদি, দামি দামি বস্ত্র, হাঁতির দাঁতের কারুকার্য করা

উপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর উত্তরণ : ঊনবিংশ শতকের তিন মহিলা চিকিৎসকে অবদানের ভিত্তিতে একটি ফিরে দেখা অধ্যায়

সামগ্রী, এমনকি একটি সাদা টাটু ঘোড়াও উপহার দেওয়া হয়েছিল। কাদম্বিনী বেশিদিন নেপালে থাকতে পারেননি। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কাদম্বিনী স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গুলীর থেকে বহু অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ সর্বদা নারী মুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন তাদের সংসার স্থায়ী হয়নি। সাতটি সন্তান ও কাদম্বিনীকে রেখে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তখন একাধারে মাতৃত্ব ও অন্যদিকে কর্মজগতের দায়িত্ব – উভয় নিয়ে কাদম্বিনী হিমসিম খেতে থাকেন (চক্রবর্তী, ১৯৯৭)। কিন্তু তিনি হার মানেননি। পরবর্তীকালে তিনি সকল দায়িত্ব পালন করে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে প্রথম দশজন প্রতিনিধির মধ্যে কাদম্বিনী ছিলেন অন্যতম। এছাড়া কাদম্বিনী গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিহার ও উড়িষ্যার কয়লাখনির মহিলা শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ও তাদের জন্য অনেক কাজ করেছিলেন (Bandyopadhyay, 2011)।

তবে কর্মজগতে তিনি বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সমাজ তখনো মহিলা চিকিৎসকদের মেনে নেয়নি। কাদম্বিনী আক্ষেপ করে বলেছিলেন হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি কখনো ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের দেওয়া হোত না। ওই পদে কাজ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও মহিলা চিকিৎসকরা বড় বড় হাসপাতালে উপযুক্ত পদে চাকরী পেতেন না। বড় বড় হাসপাতালের শল্য চিকিৎসা বিভাগে ইওরোপীয় ডাক্তার, ভারতীয় পুরুষ চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হত। ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকরা তাই নিজেদের দক্ষতা দেখাবার বিশেষ কোনো সুযোগ পেতেন না। এই আক্ষেপ শুধু কাদম্বিনীর নয়, সমকালীন প্রায় সকল মহিলা চিকিৎসকের এই আক্ষেপ ছিল।

● যামিনী সেন

যামিনী সেন একটি শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা ছিলেন। তার পিতা চণ্ডীচরণ সেন ছিলেন Sub-Judge। যামিনী সেনের পিসি ছিলেন বিখ্যাত কবি শ্রীমতী কামিনী রায়। ১৮৯০ সালে যামিনী কলকাতা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। ডিগ্রীলাভ করার পরে তিনিও কাদম্বিনীর ন্যায় সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি যে চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন তাতে নামমাত্র রুগী আসত। রুগী পাবার জন্য তখনকার মহিলা চিকিৎসকদের পুরুষ চিকিৎসকদের সুপারিশের ওপর নির্ভর করতে হোত। হতাশ হয়ে যামিনী শোলাপুরের জেনানা হাসপাতালে যোগদান করেন। তবে এখানেও তিনি বেশিদিন কাজ করতে পারেননি। তিনি নেপাল, আগ্রা, শিমলা, শিকরপুর, পুরী প্রভৃতি জায়গায় চিকিৎসা করেছেন। কাদম্বিনীর সুপারিশে যামিনী সেন নেপালের রাজপরিবারের মহিলাদের চিকিৎসা করতে ১৮৯৯ সালে নেপালে গিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ১০ বছর নেপালে চিকিৎসা করেছেন। তিনি নেপালের রাজমাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রাজমাতার স্নেহধন্য যামিনী রাজমাতার মৃত্যুর পরেই কলকাতা ফিরতে পেরেছিলেন নেপালে থাকাকালীন যামিনী সেন কাঠমুন্ডু জেনানা হাসপাতালেরও দায়িত্বে ছিলেন (দেব, ২০১০)।

১৯১৪ সালে Women Medical Service কে ডাফরিন ফান্ডের সাথে যুক্ত করা হয়। খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয় মহিলাকে ওই পদে বহাল করা হয়েছিল। যামিনী সেন ১৯১৪ সালে এই পদটি পান। (Balfour & Young, 1929)

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আশ্রা মহিলা হাসপাতালের তিনজন মহিলা ডাক্তারকে সিমলাতে বদলি করে দেওয়া হয়। তাদের জায়গায় কাজ করার জন্য যামিনী সেনকে ডাকা হয়। যামিনী মুখ বুজে একা তিনজন সাহেব ডাক্তারের কর্তব্য পালন করতে থাকেন, ছয়মাস পরে যখন পূর্বর্তন সমস্যা মিটে যায় তখন ওই তিনজন মহিলা চিকিৎসকদের আবার আশ্রায় ফিরিয়ে আনা হয়। এবার যামিনীকে ওই তিনজন মহিলা ডাক্তারের কাজ করার জন্য সিমলায় বদলি করে দেওয়া হয়। সিমলাতে মহিলা চিকিৎসকদের থাকার সুবন্দোবস্ত ছিল না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে যামিনী মহিলা চিকিৎসকদের থাকার জন্য একটি পৃথক ব্লক নির্মাণ করেন। গ্রীষ্মকাল এলে যামিনীকে আবার শিকরপুরে বদলি করে দেওয়া হয়। সুতরাং একমাত্র ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক বলে তাকে এরূপ লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হতে হয়েছিল (দেব ২০১০)।

দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এসব হাসপাতালে কাজ করলে উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তিনি ডাফরিন ফান্ডের বৃত্তি গ্রহণ করে ১৯১১ সালে ব্রিটেনে যান। সেখানে ডাবলিনের রোড্ডা হাসপাতাল থেকে LM ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১২ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘Royal Faculty of Science and Physicians and surgeons’- এর ডিপ্লোমা পান। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি এই সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি ব্রিটেন ও বার্লিনের বিভিন্ন চিকিৎসা বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত উন্নত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন। এরপরে তিনি ‘London school of tropical Medicine থেকে সার্টিফিকেট পান। এই সার্টিফিকেটের দ্বারা তিনি কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। অবশেষে তিনি Public Health এর উপরে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন বিবাহিত জীবন ও কর্মজগতের মধ্যে সমতা আনা কঠিন উপলব্ধি করে যামিনী সেন আজীবন বিবাহ করেননি (দেব ২০১০)।

● হৈমবতী সেন

কাদম্বিনীর ন্যায় হৈমবতী সেনও ব্রাহ্ম পরিবার থেকে এসেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও হৈমবতীর স্বামী উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি কখনই স্ত্রীর স্বাধীনতা পছন্দ করতেন না। হৈমবতী সংসারের একমাত্র রোজগারের মাধ্যমে হওয়া সত্ত্বেও পেশার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হবার অপরাধে ও সাংসারিক কাজকে অবহেলার জন্য তার স্বামী তার ওপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। কিন্তু তাতেও হৈমবতী হার মানেননি। সফলভাবে তার পাঁচজন সন্তানকে লালন পালন করেছিলেন। তিনি নিজের গৃহে একটি অনাথ আশ্রম চালাতেন। এখানে তিনি দুস্থ মহিলা, শিশু ও বিধবাদের দেখাশুনা করতেন। আশ্রমের মেয়েরা হৈমবতীকে এত ভালবাসত যে তার গৃহকর্মগুলি তারা হাতে হাতে করে দিত (Forbes & Raychaudhuri, 2000)।

হৈমবতী সেনের কর্মজগত প্রসঙ্গে বলা যায় যে তিনি কলকাতা মেডিকেল স্কুল থেকে Vernacular Licentiate for Medicine and Surgery— ডিগ্রীলাভ করেছিলেন। তিনি হুগলী ডাফরিন হাসপাতালে প্রথম মহিলা চিকিৎসকরূপে যোগদান করেন। যেখানে তার সহকর্মী পুরুষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা অনবরত হেনস্থা করত। (Forbes & Raychaudhuri, 2000)। এই হাসপাতালের সহকারী শল্য চিকিৎসক ছিলেন ড. মুখার্জী হৈমবতী তার তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। তিনি নানাভাবে হৈমবতীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন। হৈমবতী তাকে বহুবার সতর্ক

করা সত্ত্বেও তিনি হৈমবতীর বাড়িতে চর পর্যন্ত পাঠাতেন। একদিন ধৈর্যচ্যুত হয়ে এমন একজন চরকে হৈমবতী শারীরিক আক্রমণ করেছিলেন (Forbes & Raychaudhuri, 2000)।

হৈমবতী সেনের আত্মজীবনী থেকে তার সংগ্রামের এক মর্মাত্মিক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। একবার ডঃ দয়াল সোম হৈমবতীকে তার সহকারী হিসেবে এক ইওরোপীয় রোগীর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেমসাহেবের প্রসব প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় যাবৎ চলেছিল। প্রসবের পরে ডঃ সোম পারিশ্রমিক রূপে এক হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার মধ্যে থেকে তিনি হৈমবতীকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলেন। তাদের সাথে যে প্রসব প্রক্রিয়ায় সহকারী মহিলা গিয়েছিলেন তার পারিশ্রমিকও হৈমবতীর থেকে বেশি ছিল। এই ঘটনা হৈমবতীকে যারপরনাই আঘাত করেছিল এবং নারীরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন (Forbes & Raychaudhuri, 2000)। আর একবার একটি এগারো বছরের বালিকা তার স্বামীর দ্বারা বলপূর্বক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। বালিকাটিকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তখন হৈমবতী হাসপাতালে কর্মরতা ছিলেন, প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে বালিকাটিকে বাঁচানো যায়নি। ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তার রিপোর্টে লেখেন যে বালিকাটির বয়স চোদ্দ বছর ঋতুমতী হবার কালে তার স্ত্রীরোগজনিত সংক্রমণ হয় এবং তার ফলে বালিকাটির মৃত্যু হয়। হৈমবতী এই অন্যায় ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বলে ওই চিকিৎসক তাকে ৫০০ টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় হৈমবতী খুব অপ্রতিভ ও ভীত হয়ে পড়েন (Forbes & Raychaudhuri, 2000)।

হৈমবতী আরও লেখেন যে একবার শহরে ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হল। প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে ষাট জন আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকল। তাদের চিকিৎসা করতে করতে হৈমবতী নিজে কলেরায় আক্রান্ত হন। যে চিকিৎসক হৈমবতীর চিকিৎসা করছিলেন তিনি হৈমবতীর মেরুদণ্ডে স্যালাইন দেবার পরামর্শ দেন। হৈমবতী সেই চিকিৎসা অগ্রাহ্য করে নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন। তিনি মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয় ওঠেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে বিদেশী ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের তুলনায় হৈমবতীর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা কিছু কম ছিল না। শুধুমাত্র মহিলা হবার জন্য তার বুদ্ধিমত্তা কদর পায়নি (Forbes & Raychaudhuri, 2000)।

স্বামীর দ্বারা নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও হৈমবতী তার গৃহকার্যকে কখনো অবহেলা করেননি। তার আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে প্রতিদিন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে তিনি স্বামী ও সন্তানদের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করতেন। এরপর তার গৃহের একতলায় যে-কজন রুগী থাকত তাদের জন্যে গরমজল ও জলখাবার নিয়ে যেতেন। রুগীদের সেবা করে তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন। সন্তানদের ঘুম থেকে তুলে তাদের প্রাতরাশ করাতেন। তারপর স্বামীর প্রাতরাশ গুছিয়ে রেখে তৈরী হয়ে হাসপাতালে যেতেন। (Forbes, 2000)। হাসপাতালে রুগীদের দেখার পরেও টুঁচুড়ার বিভিন্ন গৃহে তিনি রুগী দেখতে যেতেন। এত নির্যাতনের পরেও হৈমবতী তার কর্তব্যপরায়ণতাকে বিসর্জন দেননি, একদিকে সংসার ও অপরদিকে কর্মজীবন উভয়ের মধ্যে এত সুন্দর করে তিনি সমতা বজায় রেখেছেন যা প্রশংসার দাবি রাখে। তার অনমনীয় প্রত্যয় তাকে তার লক্ষ্যে উপনীত করতে সাহায্য করেছিল।

উপসংহার

উপরে উল্লিখিত তিনজন মহিলা চিকিৎসক বহু সামাজিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে তাদের লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিলেন। যামিনী সেন বিবাহ করেননি। কিন্তু কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও হৈমবতী সেন সংসারী ছিলেন। পেশাগত কারণে দুজনের কেউই সাংসারিক দায়-দায়িত্বকে উপেক্ষা করেন নি। এখানেই এদের সাফল্য নিহিত আছে। এখানেই এই রমণীদের সাথে ইওরোপীয় মহিলা চিকিৎসকদের জীবনযাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইওরোপীয় মহিলা চিকিৎসকরা হাসপাতাল গুলিতে দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি গ্রহণ করতেন। তাদের অধীনে বহু সহকারী থাকত, যারা তাদের নানাভাবে সাহায্য করত এবং মেম ডাক্তারের আঙা পালন করার জন্য সর্বদাই সতর্ক থাকত। আর অপরদিকে ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের ভাগ্যে নিরন্তর মানসিক নির্যাতন, অবজ্ঞা ও অবহেলা জুটত। তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সকলের মনে সবসময় প্রশ্ন থাকত। নিজেদের ক্রমাগত প্রমাণ করতে করতে এরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক সময় তারা শারীরিক নির্যাতন ও যৌন আকাজ্জারও শিকার হয়েছিলেন।

কিন্তু তাও তারা হার স্বীকার করেননি। তারা রুগীদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকের মহিলা চিকিৎসকরা স্ত্রী ও শিশুদের চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, দাঁতের চিকিৎসা সর্প দংশনের চিকিৎসা প্রভৃতি সব রোগেরই চিকিৎসা করতেন। তখনো স্ত্রী চিকিৎসকরা বিশেষজ্ঞ হতে পারেননি বা তাদের জন্য এই বিশেষ বিষয়গুলি উন্মুক্ত করা হয়নি। ধীরে ধীরে এদের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্তঃপুরবাসিনীরা দেশীয় মহিলা ডাক্তার পেয়ে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের কুষ্ঠা, ভয় দূর হয়। অনেক প্রসবকারিণী মা ও শিশু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। অনেক মহিলাদের দূরারোগ্য ব্যাধি সারানো সম্ভব হয়। প্রথমদিকে হাসপাতালে হৈমবতীর রুগীর সংখ্যা ছিল বাৎসরিক ২৩০ জন। বাৎসরিক প্রায় ১৫০ জন রুগীকে তিনি গৃহে গিয়ে সেবা করতেন। ১৯০৫-০৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডঃ সেন হাসপাতালে প্রায় ৪০০ রুগীর সেবা করতেন। বাইরের বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে তার রুগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০০। ঢাকা ও মনময়নসিংহ থেকে পাওয়া একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহিলা চিকিৎসকরা হাসপাতালের তুলনায় বাড়িতে প্রায় ১০ গুন বেশি রুগী দেখতেন। ১৯০৩ সালের লেডি ডাফরিন হাসপাতালের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে প্রায় ৩৯৯ জন পর্দানসীন মহিলাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছিল। অপরদিকে প্রায় ৩৪৪ জন পর্দানসীনকে গৃহে চিকিৎসা করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ঘরের তুলনায় হাসপাতালের রুগীর সংখ্যা বেশি ছিল। এর থেকে ক্রম-পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (Bandyopadhyay, 2011)

একথা অনস্বীকার্য যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের হাত ধরে অন্তঃপুরে পৌঁছেছিল। ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকরা রুগীদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন, যার ফলে তাদের সন্মোচন দূর হয়। তারা জাতপাতের ভেদাভেদ করতেন না, অন্তঃপুরে তাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাদের পারিশ্রমিক ইওরোপীয় চিকিৎসকদের থেকে অনেক কম ছিল। তাই সাধারণ মানুষ খুব সহজেই এদের পারিশ্রমিক বহন করতে পারতেন (দেব, ২০১০)। এইভাবে ভারতীয় সমাজে একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। মহিলারা ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে এসে নতুন পৃথিবীকে দেখলেন এবং চিকিৎসার মতো একটি মহান পেশাকে গ্রহণ করলেন। যদিও এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, কিন্তু এই কতিপয় নারীর তেজস্বী পদক্ষেপ চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যায় নারীর উত্তরণ : ঊনবিংশ শতকের তিন মহিলা চিকিৎসকে অবদানের ভিত্তিতে একটি ফিরে দেখা অধ্যায়

গ্রন্থসূত্র

বাংলা বই

- দেব, চিত্রা. ২০১০ *মহিলা ডাক্তার ত্রীন গ্রহের বাসিন্দা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশনা, পৃ.৩৮-১৩২
- চক্রবর্তী, পূর্ণালা. ১৯৯৭. *ছেলেবেলার দিনগুলি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ.১২৪

English Books

- Balfour, Margaret and Young, Ruth. 1929. *The Work of Medical Women in India*, Bombay, Oxford University Press. p. 50.
- Bandyopadhyay, Mousumi. *Kadambini Ganguly: Archetypal Woman of Nineteenth Century Bengal*, Delhi, The Women Press, p. 80 -241.
- Burton, Antoinette. 1996 'Contesting the Zenana: Mission to Make "Lady Doctors for India" - 1874-1885', *The Journal of British Studies*, Vol. 35, No. 3, p. 369.
- Chawla Singh, Maina, 2005. 'Gender, Medicine and Empire: Early initiatives in Institution-building and Professionalisation, (1890s-1940s),' in Shakti Kak and Biswamoy Pati (eds.), *Exploring Gender Equations: Colonial and Post Colonial India, Nehru Memorial and Museum Library*, New Delhi, p. 100.
- Forbes, Geraldine, 2008. Education for woman, in Sumit Sarkar and Tanika Sarkar (eds), in *Women and Social reform movement in India, A Reader*, volume- 1, Indiana University Press. p. 90.
- Forbes, Geraldine and Raychaudhuri, Tapan eds., 2000, *The Memoirs of Dr. Haimabati Sen: From Child Widow To Lady Doctor*. Roli Books Pvt. Ltd., New Delhi, p. 291-364.
- Geraldine, Forbes. 2004. *Women in Colonial India*, D.C. Publishers, Delhi, p.99 -133.
- Nair, Janaki, spring 1990. "Uncovering the Zenana; Visions of Indian Womanhood in English woman's writings, 1813-1940", *Journal of Womens' History* 2, no.-11, p. 88-134.
- Mukherjee, Sujata. 2017. *Gender, Medicine and Society in Colonial India*, Oxford University Press, New Delhi.
- Mukherjee, Sujata. (August 2012), Medical Education and emergence of women medics in Colonial Bengal, Institute of development studies, Kolkata, p. 1-32.
- Ray, Sharmita. (March-April 2014), Women Doctor's Masterful Maneuverings: Colonial Bengal, Late Nineteenth and Early Twentieth Century's, *Social Scientist*, volume – 42, no. 3/4 p. 63-72.

লেখক পরিচিতি:

সহ-অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

শিশুরাম দাস কলেজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা,

ই-মেলঃ nupurdatta1974@gmail.com